International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-V, March 2016, Page No. 18-21
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

‘নতুন ইহুদী’ নাটকে প্রতিফলিত উদ্বাস্তু সমস্যা

প্রিয়ব্রত নাথ

Abstract

Partition as a result of independence has changed our life in many ways. It has affected our economic, cultural, and social life. As literature is the mirror of society, the problems relating to Partition is also reflected in contemporary Bengali literature. ‘Natun Ihudi’ by Salil Sen is one of these. In this drama Salil Sen depicted the poor condition of people as a result of partition. How people effaced problems to run their daily life is presented in this drama, not only the condition of those people but also their struggle for life is also depicted in this drama. This paper aims to discuss the socio-economic condition of the people after partition, with the help of this particular drama.

ভারতীয় তথা বাঙালি জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ সম্ভবত দেশভাগ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই আরোপিত ভৌগোলিক বিভাজন সাধারণ মানুষের জীবনের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে এসেছিল। এই দেশভাগের অন্যতম প্রধান ফলশ্রুতি হচ্ছে উদ্বাস্তু সমস্যা। যে সমস্যা অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পন্ন পরিবারগুলোকেও নামিয়ে এনেছিল পথের ধারে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো। যারা সাধারণত নিজের কষ্টার্জিত সম্ভ্রম ও সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে; তারাই বাধ্য হয়ে দুমুঠো অন্নের দায়ে নানা ধরনের অন্যায় মূলক কাজের সঙ্গে আপোস করতে বাধ্য হল। সাহিত্য যেহেতু সমাজজীবনের দলিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় দেশভাগ ও দেশভাগ-পরবর্তী ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সমস্যার করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্রায়ন আমরা দেখতে পাই। এমনই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের বাস্তব সমস্যা নিয়ে রচিত একটি নাটক হচ্ছে সলিল সেনের ‘নতুন ইহুদী’। ভারত বিভাজনের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যায় পূর্বপাকিস্তানের সাধারণ মানুষেরা যে অত্যাচারের শিকার হয়েছিল—সেই অত্যাচারিত সাধারণত মানুষেরাই এই নাটকে নতুন ইহুদী হিসেবে পরিচিত। ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের মাঝখানে দাঁড়িয়েও নতুন আলো, নতুন আশার সন্ধানে রত সাধারণ মানুষের কঠোর জীবন সংগ্রামই উক্ত নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়।

সতেরোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত এই নাটকটির অন্যতম চরিত্র মনমোহন ভট্টাচার্য। যিনি পূর্ব পাকিস্তানের একটি বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে একটি সুখী সংসারের অভিভাবক ছিলেন তিনি। কিন্তু দেশভাগের ফলে তার স্কুল থেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা উঠে যাওয়ায় তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। তিনি হয়ে পড়েন পরিচয়বিহীন। গ্র্যাচুইটির টাকা পেতে দেরি হবে তাই তিনি বসতবাড়ি বিক্রি করে পরিবার সমেত চলে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। নতুন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় এলেও, এখানকার প্রতি পদক্ষেপে তার জন্য অপেক্ষা করছিল কঠিন ও কঠোর জীবন সংগ্রাম।

চাকরি চলে যাওয়ার পর মীর্জার সঙ্গে মনমোহন বাবুর কথোপকথনে তার প্রকৃত অবস্থা অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। পণ্ডিত মনমোহন বলছেন—

> “অখন যে কি করি, বৃদ্ধ বয়সে কই গিয়া চাকরী পাই- তিনিই জানেন। এইবার থেইক্যা উপবাস আর কি! ...একটা পাগল, একটা পোলাপান- বয়স্থা মাইয়া- এই সব লইয়া আমরা বুড়াবুড়ি কি যে করমু কিছুই বুঝি না। মাত্র দুই মাসের মায়না সম্বল নিয়া নি মাইন্‌সে একটা বিদেশে অচেনা জায়গায় যাইতে পারে?”[১]

দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা নিঃস্বার্থ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তারা তো দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে কামনা করেন নি। তাঁদের স্বপ্ন ছিল অবিভক্ত স্বাধীন ভারত। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে লাভ করা এই খণ্ডিত স্বাধীনতায় ক্ষুব্ধ মোহন আজ দুঃখে বলছে—

> "...দাদারা শুধু শুধু বোকার মতন হুজুগে প্রাণ দিছে- আমি হইলে এই স্বাধীনতার লেইগা পরাণ দিতাম না।"[২]

দেশবিভাগ সাধারণ মানুষের মনে কেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা নাট্যকার মোহন আর মৌলবী মীর্জার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মোহনের কথার উত্তরে মীর্জা যখন বলে ওঠেন—

> "দেশ কথাটা মোহ নারে, দেশ মাইন্ষের মনে। জমির উপুর দেওয়াল তুলছে- মনে য্যান তুলতে না পারে।"[৩]

মৌলবী মীর্জার এই বক্তব্যে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই ভৌগোলিক বিভাজন আসলে স্পষ্টতই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরোপিত। মনের দিক থেকে দুই দেশের মানুষকে তা কোনভাবেই আলাদা করতে পারেনি।

নাটকটির দ্বিতীয় দৃশ্য থেকেই দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। মনমোহনবাবুর পরিবার ও কেষ্টর পরিবারের আশ্রয় এখন শিয়ালদহ ষ্টেশন; যেখানে কাপড় দিয়ে ঘর বানিয়ে তারা কোনোমতে আশ্রয় নিয়েছে। জমিদারী পরিবেশে বেড়ে ওঠা দুইখ্যা, মোহন, পরীরা এই অচেনা জায়গার পরিবেশের সঙ্গে কোনভাবেই মানিয়ে নিতে পারছিল না। নিত্যদিনের স্নান করতে গিয়েও পরীকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই অভিমানে সে বলে ওঠে যে, সে আর স্নান করবে না। অন্যদিকে দেখতে পাই কেষ্টকে কমটাকার বিনিময়ে জমি দেবার প্রলোভনে কে বা কারা তার সর্বস্ব লুঠ করে নিয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্যের সূচনাতেই দেখতে পাই এই উদ্বাস্তু সমস্যা যেন তার আসল চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। মনমোহন বাবু শতচেষ্টার পরও কোনোভাবেই চাকরি জোটাতে পারলেন না। অন্যদিকে দুইখ্যা কোনোভাবেই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছে না। বরং সে খাবার পছন্দমত না হওয়ায় পাতের ভাত ফেলে দেয়। এতে ক্রুদ্ধ মনমোহন বাবু তার গালে চড় বসিয়ে দিয়ে বলেন—

> "দেশ ভাতের কাঙাল, আর তুই... আর তুই।"[৪]

উদ্বাস্তু সমস্যার বলি সাধারণ মানুষদের নিজের মৌলিক প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্য কী পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই বক্তব্যে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনের চাপে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ কীভাবে মাটিতে নেমে আসে তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই নাটকে দেখা যায় যখন দুইখ্যা পরিবারের আহার জোটানোর জন্য বিভিন্ন খাবার জিনিস চুরি করে আনে। অন্যদিকে তার মাও অন্যের কাছ থেকে মিথ্যে কথা বলে চাল ধার আনেন। এদিকে মনমোহন বাবু কোন কাজ জোগার করতে না পেরে রান্নার কাজ করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। তবে কাজ জোগাড় করতে গিয়ে তাকে নানা রকম অবহেলা ও অপমানের শিকারও হতে হয়েছে। এক টাকা বারো আনা পয়সা আয়ের জন্য যে অনুষ্ঠানবাড়িতে কাজের জন্য গিয়েছিলেন তিনি; সেখানেও এই সরল হৃদয় মানুষটিকে নানারকম অপমানের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি যখন বলেন—

> "কত দিন কত লোকের আনন্দ কইরা খাওয়াছি—খাইতে না পারলে বাইন্ধা দিছি। সেইসব দিন বেশী পুরাণ হয় নাই।
> কিন্তু সেই ছান্দা-সেই অন্ন যে এত চোখের জলে কিনতে লাগবো, ভাবতেও পারি নাই। সেই ভাত যে এত নোনা-সেই ভাতে যে এত জ্বালা--"[৫]

পূর্বপাকিস্তানে অতিবাহিত করা তার স্বাচ্ছন্দ্যময় দিনগুলোর স্মৃতি এই সংলাপে স্পষ্ট প্রতীয়মান। স্মৃতির সরণি বেয়ে সেই সুন্দর দিনগুলোর উদ্বাসনই এই সংলাপের একমাত্র বিষয় নয়; সমাজের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্নও যেন প্রকাশিত এখানে। যে প্রশ্ন জানতে চায় যে, দেশভাগের বলী এই সাধারণ মানুষগুলোর করুণ অবস্থার দায় আসলে কার?

এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও পরিবারের ছোট ছেলে মোহনের মানুষ হবার বাসনা ত্যাগ করতে পারেন না তার মা। কিন্তু মোহন পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ববোধকে এড়াতে পারে না। তাই সে তার মা কে বলে—

> "তুমি আর পরীক্ষার কথা কইও না-। কিষ্টগো ওইখানে কারখানায় চাকরীর খবর পাইছি-সেই কাজেই লাইগা যামু-।"[৬]

দুইখ্যাও কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। তবে পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সে সস্তা চুরির পথ বেছে নেয়।

একটি ধর্মঘট চলতে থাকা কারখানায় মোহন চাকরি নেওয়ায় মহেন্দ্র তাকে তার ভুল বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এই সূত্রে দুয়ের কথোপকথনে বাস্তুহারা মানুষ ও এখানকার সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ উভয়ের সমস্যার জ্বলন্ত প্রকাশ ঘটেছে। একদিকে মোহনরূপী বাস্তুহারাদের পরিবার যেমন উপবাসী; তেমনি ধর্মঘটে রত স্থানীয় লোকরাও অনাহারী- সম্বলহীন। মোহন যে প্রশ্নগুলো মহেন্দ্রর সামনে রেখেছিল তা শুধু মহেন্দ্রের জন্য নয়- এ প্রশ্ন আসলে গোটা সমাজের কাছে।

> "আমাগো ছোট ছোট ছেলেরা পকেট কাটে; পড়াশুনা করে না - ট্রামে বাসে চুরি কইরা বিনা পইসায় চড়ে - আমাগো বউ ঝিরা বে-আব্রু হইয়া রাস্তায়, দোকানে, হাটে বাজারে উদরান্নের সংস্থানের লেইগা সৎ অসৎ নানা রকম গোপন বৃত্তি গ্রহণ করে, প্রমাণ হয় আমরা ইতর - আমরা নীতিহীন। ...আমরা কেন আইসা সেই পথেই আশ্রয় নিছি, তা কি ভাইবা দেখছেন?"[৭]

হঠাৎ একদিন পরীর সঙ্গে যতীনের পরিচয় হল। যতীন নিজে থেকে পরীকে তার বাবার জন্য ঔষধ, ফল-মূল ইত্যাদি কিনে দিল। এতে পরীকে তার ঘরে নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরে যতীন পরীকে বড়বাবুর প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু পরী তা মানতে চায় নি। সে পরীকে নানারকম প্রলোভন দেখালেও তাকে মানাতে পারে নি। কারণ পরী তার মানসম্মান ও লজ্জাসম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। যতীন পরীকে বলেছে—

> "...যদি লোক দেখানো সতীপনা না করতে তো তুমিই ওদের খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখতে পারতে। ...বেশী সতীপনা না ফলিয়ে আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো।"[৮]

এখানেই শেষ নয়, সে আরও বলেছে—

> "নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ—মনে সম্ভ্রম আর আছে কিনা? ওই শাড়িতে কি আর দেহের সম্ভ্রম ঢাকা যায়? যায় না! যে সম্ভ্রমের কথা বলেছিলে—সেটা বাঁচাতে হলেও, শাড়ীর দরকার, টাকার দরকার।"[৯]

যতীনের এই সংলাপে গৃহহারা যুবতী মেয়েদের বাস্তব সমস্যার মর্মান্তিক চিত্রায়ণ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। সেই সঙ্গে পরীর কান্না পরিস্থিতিকে আরও করুণ করে তুলেছে। উদ্বাস্তু সমস্যার যে অবশ্যম্ভাবী ফল দারিদ্র্য - সেই দারিদ্র্য যে মেয়েদের মানসম্ভ্রমকেও পথে নামিয়ে এনেছিল এরও জ্বলন্ত প্রমাণ এই নাটকটি। যতীনের কথায় পরী অপমানিত বোধ করে। কিন্তু নিরুপায় সে। তাই তো অভিমানের সুরে সে মোহনকে বলে—

> "...আমি তো মাইয়া লোক - সাধ আহ্লাদ না থাকুক - আমার তো লজ্জা কইর‍্যা একটা বস্তু আছে। না, তা-ও খোয়াইতে লাগব। - এই দেহের লজ্জা যদি মুচাইতে পারতাম..."[১০]

এই অভিমান শুধু পরীর একার নয়- এ যেন পরীর মতো অসংখ্য মেয়েদের অন্তর্বেদনার বহিঃপ্রকাশ, আত্মসম্মানের বোধ কিন্তু বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না—অভাব তার ভিত নাড়িয়ে দেয়। তাই তো মোহন যখন দুইখ্যার চিকিৎসাবাবদ টাকা সংগ্রহ করতে নাস্তানাবুদ হচ্ছিল, তখন পরী বলে উঠে—

> "আত্মসম্মান? আত্মসম্মান?... আমি দিমু আমি কিন্তু পারি, একজনের থেইকা--"[১১]

দারিদ্র্যের অসহায়তার মধ্যেও প্রবল আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবার সংগ্রামে রত এই মানুষগুলোর বোধকে পরীক্ষা করার জন্য নাট্যকার সম্ভবত যতীন চরিত্রের অবতারণা করেছেন। তাই তো সে বার বার সেই 'অর্থহীন' আত্মসম্মানবোধকে প্রশ্ন করতে চেয়েছে। সে পরীকে বলে—

> "কে দিল তোমার ভদ্রতার দাম? তোমার বাবার চিকিৎসা হয় না কেন? তোমার ভাই কিসের তাড়নায় ট্রামে চাপা পড়ে? অভাব... অভাবই একমাত্র পাপ ...যার ফলে - তোমার মাকে আজ বাঁধানো নোয়া খুলে দিতে হয়েছে। স্বামীর মঙ্গলের সংস্কার আজ পেটের খিদের চাপে চাপা পড়েছে।"[১২]

অভাবের তাড়নাই জয়ী হয়। পরী যতীনের কাছ থেকে একশ টাকা ধার নেয়। এবং শেষপর্যন্ত পরিবারের প্রয়োজনে ঘর ছাড়তেও বাধ্য হয়। উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে এতে নারীর পারিবারিক, সামাজিক অবস্থানও খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শেষে দুইখ্যার মৃত্যু, পরীর গৃহত্যাগ ও মনমোহনবাবুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকটি পরিণতির দিকে যাত্রা করেছে। মনমোহনবাবু তার পূর্ব পাকিস্তানের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে সংগ্রামী জীবণের মূল্যবোধকে কোনোমতেই খাপ খাওয়াতে পারেন নি। তাই তো তার শরীর ও মন কোনোটাই টিকতে পারে না এই সংগ্রামের মধ্যে। মোহন শুধু রয়ে যায় নতুন দিনের প্রত্যাশা হয়ে। মহেন্দ্রের কথায় সেই প্রত্যাশার কথাই ফুটে ওঠে। মহেন্দ্র বলে—

"মনে মনে সমস্ত প্রপীড়িতদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শপত নাও যে স্বার্থলোভী অর্থলোলুপ যারা তোমাদের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাদের শাস্তি দেবে। হৃদয়হীন শোষকদের অত্যাচার তুমি খতম করবেই, ভাগ্যের গোলামী তুমি আর বরদাস্ত করবে না কিছুতেই।"[১৩]

দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে নাট্যকার এই নাটকে বিশেষ করে একটি পরিবার ও তাকে ঘিরে থাকা কয়েকটি চরিত্রের সংগ্রামী জীবনকে তুলে ধরেছেন। একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সত্ত্বেও নাটকটিতে উদ্বাস্তু সমস্যার সার্বিক রূপ খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এক একটি চরিত্র যেন হয়ে উঠেছে এক একটি শ্রেণির প্রতিনিধি স্বরূপ— এখানেই নাটকটির অন্যতম সার্থকতা। এছাড়া কথ্যভাষার সার্থক প্রয়োগও নাটকটির বিষয়কে বাস্তবতা দান করেছে। সব মিলিয়ে দেশভাগের প্রতিফলন হিসেবে 'নতুন ইহুদী' নাটকটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন।

উল্লেখসূত্র

১। নতুন ইহুদী : সলিল সেন, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ- ২৭।
২। তদেব, পৃ- ৩০।
৩। তদেব, পৃ- ৩১।
৪। তদেব, পৃ- ৪০।
৫। তদেব, পৃ- ৫৩।
৬। তদেব, পৃ- ৫৫।
৭। তদেব, পৃ- ৬৪।
৮। তদেব, পৃ- ৭৮।
৯। তদেব, পৃ- ৭৮।
১০। তদেব, পৃ- ৭৯।
১১। তদেব, পৃ- ৮০।
১২। তদেব, পৃ- ৮২।